দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ২০ এপ্রিল, ২০২০।। ৭ বৈশাখ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com ।। নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা।।

করোনার করাল গ্রাসে ম্লান বাংলা নববর্ষের আনন্দ

জেনে রাখুন সংক্রমণ ঠেকাতে মাস্ক একান্ত জরুরি ?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ৭ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২০ এপ্রিল - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

কাশি থাকলে মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করুন
▯ ডা: উচ্ছল কুমার ভদ্র ▯ ৫

সরকারি নিয়মাবলী আত্মরক্ষার তাগিদেই মেনে চলতে হবে
▯ ডা: শুভঙ্কর গৌড়া ▯ ৮

শ্রীরামকথা শত শত বছর ধরে ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনাকে উজ্জীবিত রেখেছে ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ১২

করোনা মোকাবিলায় সেই ব্রিটিশ আইনই ভরসা
▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ১৬

চার কার্যকর্তার আত্মবলিদানে রঞ্জিত কাঞ্চনছড়া রতনমণি শিশুশিক্ষা নিকেতন ▯ লক্ষ্মণ দেব ▯ ১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ৯-১০ ▯ সমাবেশ-সমাচার :১১ ▯ রঙ্গম : ১৯ ▯ চিত্রকথা : ২০

সবিনয় নিবেদন

করোনার করাল গ্রাসে এবার নববর্ষের আনন্দ ম্লান। বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে স্বস্তিকার কয়েকটি নিয়মিত সংখ্যা আমাদের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ইচ্ছা থাকলেও নববর্ষ সংখ্যাটি আমরা পূর্বপরিকল্পিত আকারে প্রকাশ করতে পারিনি। আশা করি, আমাদের প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, প্রচার প্রতিনিধি এবং সকল শুভানুধ্যায়ীরা বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই অপারগতার জন্য আমাদের ক্ষমা করবেন। তবে, যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হচ্ছে এবং আমাদের পক্ষেও পূর্ণাঙ্গ কলেবরে স্বস্তিকা প্রকাশ করা সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন প্রতি সপ্তাহে ইন্টারনেটে প্রকাশ করে যাব স্থির করেছি। আশা রাখি, পাঠক-পাঠিকা, লেখক, শুভানুধ্যায়ী সকলের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা আমরা পাব।

আপনাদের সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। লকডাউন সম্পূর্ণভাবে মেনে চলুন।

সম্পাদক মণ্ডলী, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এক কঠিনতম লড়াই

এক অজানা, অচেনা ব্যধির বিরুদ্ধে সমগ্র মানব সমাজ আজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই শত্রুকে চাক্ষুষ করা যাইতেছে না। অথচ এই শত্রুর বিষাক্ত নিঃশ্বাস সর্বদাই অনুভব করা যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী এমন কঠিন সংকটের মুখে মানব সভ্যতা আর পড়ে নাই। তার চরিত্রটি যেহেতু অদৃশ্য, এবং কোন অস্ত্রে শেষ পর্যন্ত তাহাকে ঘায়েল করা যাইবে, তাহা এখনও সকলের অজানা, তাই যুদ্ধটি ক্রমশই কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বব্যাপী মৃত্যুমিছিল আমাদের সকলকেই এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। এই মারণ জীবাণুটির আবিষ্কর্তা কমিউনিস্ট কার্যত সমগ্র মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে সমগ্র মানব সমাজকে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমগ্র দেশবাসীর কাছে বারংবার সেই আহ্বানই জানাইতেছেন। তাঁহার আহ্বানে দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়াও দিয়াছে। তবুও এই সংকটের মুহূর্তেও দেশের ভিতরে একটি শ্রেণী দেশকে, দেশবাসীকে বিপর্যস্ত করিবার নিরন্তর প্রয়াস করিয়া যাইতেছে। দিল্লির নিজামুদ্দিনে বা মুম্বাইয়ের বান্দ্রা রেল স্টেশনে লকডাউনকে কার্যত অমান্য করিয়া কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত এই নাশকতামূলক আচরণের প্রমাণ। ফলে ভারতকে শুধু করোনা নামক চীনা মারণাস্ত্রটির বিরুদ্ধে নহে, লড়িতে হইতেছে দেশের ভিতরে অবস্থানকারী এই নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধেও। তবে ভারত এই লড়াই দৃঢ়তার সঙ্গেই লড়িতেছে। ইতিমধ্যেই বিশ্বে ভারতের এই লড়াই সকলের সম্ভ্রম আদায় করিয়াছে। করোনা যুদ্ধে ভারত বিশ্বকে পথ দেখাইবে। শত্রুকে পরাজিত করিয়া এক সুস্থ সুন্দর প্রভাত আনয়ন করিবে— ইহা নিশ্চিত।

সুভাষিতম্

সুখং শেতে সত্যবক্তা সুখং শেতে মিতব্যয়ী।
হিতভুক্ মিতভুক্ চৈব তথৈব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।।

সত্যবক্তা, মিতব্যয়ী, মিতাহারী এবং যিনি ইন্দ্রিয় জয় করেছেন, তিনি আনন্দ ও শান্তিতে ঘুমাতে পারেন।

কাশি থাকলে মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করুন

ডাঃ উচ্ছল কুমার ভদ্র

ডিসেম্বরে ২০১৯-এ চীনের উহান প্রদেশের মাংসের বাজারে নতুন করোনাভাইরাসের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে যে দুটো তত্ত্ব রয়েছে, তার প্রথমটি হলো : এটি প্রাণীদেহে অন্যান্য ভাইরাসের সঙ্গে জিনগত সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত নতুন প্রজাতির এক ভাইরাস, যা মানুষের দেহেও বংশবিস্তার করতে পারে (এমন ঘটনা প্রাণীদেহে হামেশাই ঘটছে, কিন্তু উৎপন্ন বহু প্রজাতির মধ্যে হাতে গোনা যে কটি ভাইরাস প্রাণী ও মানবদেহে দু' জায়গাতেই বংশবিস্তার করতে পারে, তারাই অসুখের উৎপত্তি করে)।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি হলো : এই ভাইরাস চীন তার উহান প্রদেশে অবস্থিত জৈবাস্ত্র গবেষণাগারে জিনগত গবেষণায় তৈরি করেছে এবং কোনও কারণে এটি বাইরে বেরিয়ে পড়ে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। রোগটি চীন ছাড়িয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ায় গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে প্যানডেমিক বা বিশ্ব-মহামারী ঘোষণা করেছে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ অসুখ সম্পর্কে আলোচিত বহু প্রশ্নের একটি হচ্ছে : ব্যক্তিগত

স্তরে এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে যা যা করণীয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে 'মাস্ক' বা মুখোশের ব্যবহার। এই 'মাস্ক' কীভাবে কাজ করে? কারা পরবে, আর কাকে কতটা সুরক্ষা দেবে?

করোনাভাইরাসের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এখনও সবকিছু জানা না গেলেও যতটুকু জানা গেছে, তা হচ্ছে এটা হাঁচি-কাশির সঙ্গে নির্গত জলকণার মধ্যে থাকে। সেই জলকণা ছড়ানো বন্ধ করতে পারে মাস্ক। ওই জলকণা অন্য কেউ সরাসরি নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিলে বা তার চোখে-মুখে পড়লে কিংবা তা পারিপার্শ্বিক জিনিসপত্রে পড়ার পর সেখানে হাত লাগালে সেই হাত চোখে বা মুখে লেগে দেহে সংক্রমণ আসতে পারে। ওই জলকণা বাতাসে শুকিয়ে গেলে সেই খোলা ভাইরাস কতটা দূরে গিয়ে সংক্রমণ ঘটাতে পারে তা এখনও জানা যায়নি।

মাস্কে একটা ফিল্টার বা ছাঁকনি থাকে, যা রোগ-জীবাণু সংবলিত হাঁচি-কাশির জলকণা আটকে দেয়। ওই ছাঁকনি তৈরি হয় বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো এক ধরনের প্লাস্টিক শিট থেকে। বলা হচ্ছে ছাঁকনি— যদিও কেটলির চা যে পদ্ধতিতে ছাঁকা হয় মাস্কের ছাঁকার পদ্ধতি তার থেকে আলাদা। 'ছাঁকনি'র ফেব্রিকের স্তরে যে ছিদ্রগুলো রয়েছে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংবলিত জলকণা তার থেকে আকারে বড়ো

হলেও ওই ছিদ্রে আটকে যায়। কারণ ওই ছাঁকনিতে একটা স্থির-বিদ্যুতের চার্জ দেওয়া থাকে এবং সেই চার্জ জীবাণুদেহের বিপরীত চার্জের জন্য তাকে ছাঁকনির গায়ে আটকে ফেলে। কতটা আটকায়, তা দিয়ে ওই মাস্কের কার্যকারিতার হিসেব হয়। মাস্কের কার্যকারিতার আর একটা নিয়ামকও রয়েছে; তা হলো মাস্ক এবং ব্যক্তির মুখের চামড়ার মধ্যে ফাঁক। ওই ফাঁক সাধারণত থাকে নাকের দু'পাশে এবং কম-বেশি অন্যত্রও। ওই ফাঁক দিয়ে সংক্রমণ হতেই পারে; তাতে মাস্কের কার্যকারিতাও কমে যায়। কিন্তু নির্মাণের কৌশলে মাস্ক রোগ প্রতিরোধে প্রায় ১০০ শতাংশ কার্যকরী হতে পারে।

বাজারে মোটামুটিভাবে তিন রকমের মাস্ক পাওয়া যায় : সার্জিক্যাল মাস্ক, এন-৯৫ বা ওই জাতীয় মাস্ক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক মাস্ক। সার্জিক্যাল মাস্ক (ভেতর দিকে সাদা, আর বাইরের দিকে নীল বা সবুজ)-এর তিনটে স্তর; মাঝের স্তরে থাকে ওই বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো 'ছাঁকনি'। সার্জিক্যাল মাস্কের ব্যবহার হয় ব্যবহারকারীর শরীর থেকে হাঁচি-কাশির জলকণা ও রোগজীবাণু যাতে বাইরে না ছড়ায় তা নিশ্চিত করতে। শল্যচিকিৎসক যখন অপারেশন করেন, তিনি এবং তাঁর সঙ্গের অন্যান্যরা রুগির সুরক্ষার জন্যই মাস্ক পরেন।

সার্জিক্যাল মাস্ক ছাড়াও দ্বিতীয় যেসব মাস্ক রয়েছে তা হচ্ছে : এন-৯৫, এন-৯৭, এন-৯৯, এন-১০০ ইত্যাদি; এই মাস্কগুলোর নামে যে সংখ্যাটা রয়েছে, তাতে বাতাসে অবস্থিত বিভিন্ন কণার কত শতাংশ ওই মাস্কটি ফিল্টার করে বা ছেঁকে আটকে দেবে তা বোঝায়। এগুলো ভাইরাস আটকাতে সক্ষম। এগুলোকে আসলে মাস্ক না বলে 'রেসপিরেটর' বলা হয়। মাস্ক আর রেসপিরেটরের মূল পার্থক্য হচ্ছে মাস্ক যিনি পরবেন তাঁর হাঁচি-কাশির সংক্রমণ বাইরে ছড়াবে না; আর রেসপিরেটর যিনি পরবেন তিনি বাতাসে ঘুরে বেড়ানো ভাইরাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিয়ে নিজে সংক্রামিত হবেন না। বলাই বাহুল্য, ওই রেসপিরেটরগুলোর কোনোটাই খুব সহজলভ্য নয়, সবগুলোই দামি, ব্যবহারকারীর মুখে এগুলো খুব আঁটোসাটো হয়ে সেঁটে বসার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রত্যেকের মুখের গড়ন আলাদা হয় বলে একটি মাস্ক একজনই ব্যবহার করতে পারেন। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা ওগুলো শুধুমাত্র ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর জন্যই সুপারিশ করেন, যাঁরা এই ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে তাঁর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করছেন। ওগুলো সাধারণ মানুষের জন্য নয়।

তৃতীয় ধরনের অর্থাৎ বাজারের অন্যান্য বাণিজ্যিক মাস্কগুলো এই সময়ে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে এবং মানুষ সেগুলো হই হই করে কিনে চলেছেন। সেগুলো কতটা সুচারু পদ্ধতিতে তৈরি? প্রশ্নটি অত্যন্ত বড়ো প্রশ্ন এবং ব্যবসায়ীরা এই বর্তমান পরিস্থিতির ফায়দা তুলবেন কিনা, সেটা মাথায় রেখেই। বাজারে অনেক রকমের ফেব্রিক (কাপড় ও প্লাস্টিক)

করোনা ভাইরাস নিয়ে দশটি রটনা

সোশ্যাল মিডিয়ায় আজকাল অনেকেই করোনা ভাইরাস নিয়ে নানারকম পোস্ট করছেন। বলা বাহুল্য, এইসব পোস্ট জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন না কোনটা বিশ্বাস করবেন আর কোনটা করবেন না। স্বস্তিকা এরকম দশটি রটনাকে বেছে নিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্যের সঙ্গে যাচাই করে প্রকৃত সত্য এখানে দেওয়া হলো।

রটনা ১ : খুব ঠাণ্ডায় করোনা ভাইরাস বাঁচে না।

উত্তর : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে এরকম কোনও তথ্য নেই। ভাইরাস থেকে বাঁচার সব থেকে কার্যকরী উপায় সাবন দিয়ে ঘনঘন হাত ধোওয়া।

রটনা ২ : গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় করোনা ভাইরাস বাঁচে না।

উত্তর : এই রটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে। অনেকেরই ধারণা

ভারতে গরম আর একটু বাড়লেই ভাইরাস পালাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, এ ব্যাপারে এখনই নিশ্চিত করে বলার মতো সুনির্দিষ্ট তথ্য তাদের কাছে নেই।

রটনা ৩ : ফুটন্ত গরম জলে স্নান করলে সংক্রমণ হয় না।

উত্তর : ভুল। এরকম কখনও হয় না।

রটনা ৪ : করোনার ওষুধ বেরিয়ে গেছে।

উত্তর : গবেষণা চলছে। ওষুধ এখনও বেরোয়নি।

রটনা ৫ : করোনা ভাইরাস মশার মাধ্যমে ছড়ায়।

উত্তর : এরকম কোনও তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে নেই।

রটনা ৬ : ড্রায়ার দিয়ে হাত শুকিয়ে নিলে সংক্রমণ হয় না।

উত্তর : ড্রায়ার থেকে নির্গত তাপের সাহায্যে ভাইরাসকে মেরে ফেলা যায়— এ ধারণা ভুল।

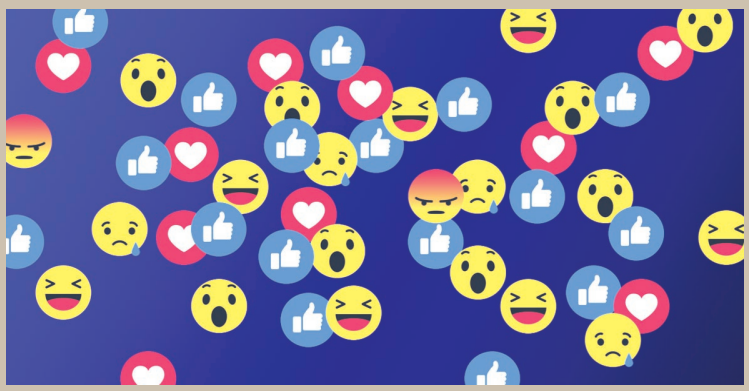

করোনা সংক্রমণ সেরে যায়।

উত্তর : ব্যাকটেরিয়াজনিত অসুখে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে কাজ হয়। ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না।

রটনা ৮ : করোনা সংক্রমণের ভয় বৃদ্ধদের বেশি। যুবকেরা নিরাপদ।

উত্তর : যে কোনও বয়েসের মানুষ করোনা ভাইরাসের কবলে পড়তে পারেন। তবে যাদের হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস এবং ফুসফুসের অসুখ আছে তাদের ঝুঁকি বেশি।

রটনা ৯ : কাঁচা হলুদ খেলে করোনা সংক্রমণ হয় না।

উত্তর : এ ব্যাপারে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

রটনা ১০ : থার্মাল স্ক্যানার সংক্রমণ হয়েছে কিনা বলে দিতে পারে।

উত্তর : থার্মাল স্ক্যানার (উদাহরণ : থার্মোমিটার) শুধুমাত্র শরীরের তাপমাত্রা মাপতে পারে। কী ধরনের সংক্রমণের কারণে তাপমাত্রা, তা বলতে পারে না।

(তথ্য : ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন)

পাওয়া যায়; বেশিরভগই (যেমন রুমাল) ভাঁজ করে নাকে চাপা দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস করা চলে (অর্থাৎ ওই ফেব্রিকে ছিদ্র যথেষ্ট বড়ো)। আবার এমন ফেব্রিকও বিশেষভাবে তৈরি করা যায় যার ভেতর দিয়ে ওই রকমভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আদান-প্রদান দৃশ্যতই করা যায় না। সাধারণ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যে বাণিজ্যিক মাস্কগুলো বিক্রি হয় সেগুলোতে ঠিক কী ধরনের ফেব্রিক ব্যবহার করা হয়েছে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায় এবং কাজে কাজেই, তাদের কার্যকারিতাও প্রশ্নাতীত নয়। এগুলোর কার্যকারিতা কমবার আর একটা কারণ মাস্ক এবং মুখের চামড়ার মধ্যে ফাঁকও।

মাস্ক কারা ব্যবহার করবেন? আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা একমত যে, মাস্ক তাঁদেরই ব্যবহার করা উচিত, যাঁদের সর্দি-কাশি হয়েছে, অর্থাৎ যাঁরা হাঁচছেন বা কাশছেন। মাস্ক পরলে তাঁদের হাঁচি-কাশির সঙ্গে নির্গত জলকণা-পরিবৃত জীবাণু বাতাসে ছড়াবে অনেকটাই কম, অর্থাৎ সংক্রমণ ছড়াবে কম। তবে কি যাঁরা অসুস্থ নন, অর্থাৎ যাঁদের হাঁচি-কাশি নেই, তাঁরা মাস্ক পরবেন না? না, প্রয়োজন নেই; মাস্ক পরলে তাঁদের মনে একটা 'আমি সুরক্ষিত' ভাব আসতে পারে, যা সঠিক নয়, কেননা অন্যের হাঁচি-কাশি তাঁদের জামাকাপড়ে পড়ে সেগুলো থেকে তাঁর হাতে এবং হাত থেকে চোখে সংক্রমণ পৌঁছে দিতে পারে। এই মুহূর্তে সবাই দৌড়াদৌড়ি করে মাস্ক কিনছেন, ফলে বাজারে মাস্কের আকাল দেখা দিয়েছে বা অচিরেই দেবে। মাস্ক পরার দরকার হলে এবং পাওয়া না গেলে বাড়িতে কাগজ বা রুমাল একাধিক স্তরে ভাঁজ করে মাস্ক বানিয়ে নিন। আর রেসপিরেটরের সম্পর্কে তো আগেই বলা হয়েছে, ওগুলো ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মী বা আক্রান্ত রুগির পরিচর্যাকারীর জন্য।

সুস্থ মানুষ মাস্ক না পরলেও তাঁরা সবার থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন, বিশেষত যাঁর হাঁচছেন বা কাশছেন তাঁদের থেকে। এই দূরত্ব কতটা? গবেষণায় দেখা গেছে যে, হাঁচি বা কাশির ফলে নির্গত জলকণা সর্বাধিক ছয় মিটার (১৮ ফিট!) অবধি ছড়াতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দু'এক মিটারের বেশি যায় না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলেছেন। বলাই বাহুল্য, যত বেশি দূরত্ব বজায় রাখা যায়, সুরক্ষা ততই বেশি। আর এছাড়া ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং বিশেষত ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান মেখে হাত ধোওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। যেহেতু এই করোনা ভাইরাস হাঁচি-কাশির সঙ্গে নির্গত জলকণার ভেতরে থাকে, ওই জলকণা যেখানে পড়বে, সেখানে আপনার হাত লাগলে আপনার হাতে এসে যাবে ওই ভাইরাস, আর তারপর আপনি নিজেকে সংক্রামিত বা আশেপাশের অন্যান্য নির্জীব বস্তুকে সংক্রামক করে ফেলতে পারেন। সেই কারণেই বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান মেখে হাত ধুতে বলা হচ্ছে। জল ব্যবহার করার অবস্থা না থাকলে হাতে অ্যালকোহল-যুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতেও বলা হচ্ছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সত্যিই কোনও বিকল্প নেই। স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প সেই কারণেই দেশের সর্বকলের সবচেয়ে জরুরি প্রকল্পগুলোর একটি।

(লেখক বেলেঘাটার সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হন)

সরকারি নিয়মাবলী আত্মরক্ষার তাগিদেই মেনে চলতে হবে

ডাঃ শুভঙ্কর গৌড়া

নোভেল করোনাকে হু মহামারী ঘোষণা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সোমবার মহামারী আইন লাগু করলেন। রাজ্যে যাতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের লড়াইয়েতে কেউ অসহযোগিতা করতে না পারে। ওই আইন কী সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়? তা না হলে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারির ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসকদের নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে দুদিন সরকারি অফিস ও শপিং মলে নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়ালেন। এর ফলস্বরূপ কোভিড-১৯ পশ্চিমবঙ্গে মহামারী আকার ধারণ করতে পারে। এই একজনের রোগসংক্রমণ থেকে সব মিলিয়ে প্রায় ২০ জনকে হোম কোয়ারান্টাইন এবং ৫ জনকে কোয়ারন্টাইন করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণে ভারত যেন ইতালি না হয়। তার জন্য হাতে প্রায় ৩০ দিন। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার মানুষকে স্ক্রিনিং কর হয়েছে। ৫ হাজার মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। গৃহপর্যবেক্ষণে ১২০০০ জনকে রাখা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ, ইতালিতে প্রথম সপ্তাহে ৩ জন, দ্বিতীয় সপ্তাহে ১৫২ জন, তৃতীয় সপ্তাহে ১০৩৬ জন, চতুর্থ সপ্তাহে ৬৩৩২ জন, পঞ্চম সপ্তাহে ২৭৯৮০ জন আক্রান্ত। মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৩০০০ জন। ভারতে প্রথম সপ্তহে ৩ জন, দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৪ জন, তৃতীয় সপ্তাহে ১০৫ জন, বাকি এখনো চতুর্থ, পঞ্চম।

ভারত এখন 'ফেজ-২', 'ফেজ-৩' যখন তখন শুরু হতে পারে এই আশঙ্কায় এখন ভারতের ১৩০ কোটি জনসাধারণ। সেইদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা প্রায় ৯ কোটি। এই অবস্থায় ২৬টি সরকারি হাসপাতালে আইসোলেশন বেড করা হয়েছে যার সংখ্যা মাত্র ১৮১টি। যা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার তুলনায় অতি সামান্য।

এই কোভিড-১৯ ভাইরাস গুণিতক আকারে সংক্রামণ বৃদ্ধি পায় মানুষের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরে ৩০ দিনের মধ্যে এত সংখ্যক আইসোলেশান বেড করা সম্ভব নয়, যদি ফেজ-২ থেকে ফেজ-৩ আরম্ভ হয়। যার ফলস্বরূপ শুরু হতে পারে মৃত্যুমিছিল। যদিও এই করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর হার শতকরা ২ থেকে ৩ শতাংশ তবুও সেই সংখ্যাটি কম হবে না। প্রায় ৫ থেকে ১০ হাজারের মধ্যে। এই ভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে প্রায় ২ লক্ষ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই।

তাই সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর সম্পূর্ণ রূপে ভরসা না রেখে নিজেদেরকেই আরও বেশি সচেতন থাকতে হবে। সরকারি সতর্কতার নিয়মাবলীগুলিকে যথাযথ ভাবে মেনে চলতে হবে নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদেই।

তাহলেই হয়তো অনেকটাই এই ভাইরাসের প্রকোপ থেকে নিজেদের আড়াল করা সম্ভবপর হবে। কারণ এই করোনা ভাইরাসের এখনো পর্যন্ত সঠিক কোনো প্রতিষেধক নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

মাস্ক পরা কতটা জরুরি

মাস্ক পরা অবশ্যই জরুরি। তবে সবাইকেই যে পরতে হবে এমন নয়। তাই কারা মাস্ক পরবেন সেটা জেনে নেওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

- যদি আপনি সুস্থ (সর্দি কাশি জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট যদি না থাকে) হন তাহলে আপনার মাস্ক পরার দরকার নেই। কিন্তু যদি আপনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে যান, কিংবা তার পরিচর্যা করেন, অথবা গত দু-তিন মাসের মধ্যে করোনা মহামারীতে আক্রান্ত কোনও দেশ থেকে আসা ব্যক্তির কাছাকাছি যান, তা হলে সুস্থ হলেও মাস্ক পরুন।
- মাস্ক পরার উদ্দেশ্য হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ থেকে বেরিয়ে আসা জলকণা আটকানো। সুতরাং হাঁচি-কাশি থাকলে অবশ্যই মাস্ক পরুন। এছাড়া যাদের ক্রনিক হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস জাতীয় অসুখ রয়েছে তাদেরও মাস্ক পরা দরকার।
- ঘনঘন সাবান দিয়ে হাত না ধুলে (অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে) মাস্ক পরেও কোনও লাভ হবে না।

(তথ্যসূত্র : ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন)

চিঠিপত্র

করোনা আতঙ্কে ফিরছে সনাতন রীতি

সারা বিশ্বে যেভাবে করোনা ছড়াচ্ছে সেখানে বেঁচে থাকাই খুবই দুষ্কর। তদুপরি এই মারণ রোগের ওষুধ প্রায় নেই বললেই চলে। চীন-ভারত আফ্রিকা ইতালি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ আরব, ওমান, কাতার সব দেশের মানুষই মৃত্যুর আশঙ্কায় দিন গুনছে। সবাই ভাবছে কী পদ্ধতি অবলম্বন করলে ছোঁয়াছুঁয়ি এবং রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত থাকা যায়। হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রোগী রেখেও ডাক্তার, নার্সদের স্বস্তি নেই। একসময় ছিল ওলাওঠা রোগ। শব দাহ করতে গিয়ে ফেরার পথে দু'একজনের শুরু হতো ভেদ বমি। রোগীকে রাস্তায় রেখেই বাকিরা ছুটে পালাতো। গ্রামকে গ্রাম শেষ হয়ে যেত। বাকি লোক ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতো। তারপরে পুরো গ্রামটাই হয়ে যেত ভূতের গ্রাম। তখন অবশ্য ডাক্তারের ও ওষুধপালার তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। বিজ্ঞান ছিল না এত উন্নত। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা সত্ত্বেও মানুষের বেঘোরে প্রাণ যাচ্ছে। ডেংগু, করোনা মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে। মানুষ সমাজ ও ধর্মকে কাছে টানতে পারছে না। বাঁচার তাগিদে জলাঞ্জলি দিচ্ছে নতুন পদ্ধতিকে। ফিরছে প্রাচীন সনাতন পদ্ধতি। দূর থেকে দু'হাত তো জোড় করে করছে নমস্কার। ভেস্তে যাচ্ছে করমর্দন প্রথা। বন্ধ হচ্ছে কবর দেওয়ার পদ্ধতি। সবাই পুরাতন পদ্ধতিকে বেছে নিচ্ছে জীবাণু ধ্বংস করার স্বার্থে। এই পদ্ধতিতে যেমন জায়গার সমস্যা হয় না, তেমনি জীবাণু থেকে বাঁচার একটি মোক্ষম পদ্ধতিও বটে। তাই সনাতন পদ্ধতি গ্রহণ করাকে আমি যুক্তিযুক্তই মনে করি।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

সাঁইবাড়ির কান্না

সম্প্রতি একটি দুঃস্বপ্নে হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম কী বর্ধমানের সাঁইবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ভেতরে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কান্নাকাটি করছেন। তিনি মলয় সাঁই ও প্রণব সাঁইয়ের মাতৃদেবী। আমি জিজ্ঞাস করলাম মাসিমা কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, 'আর বলো না বাবা সকলে সংবাদপত্র হাতে নিয়ে দেখলাম বিজেপিকে ঠেকাতে কংগ্রেস এবং সিপিএম হাত মিলিয়েছে, তাড়াতাড়ি সংবাদটা পাশের ঘরে শায়িত মলয় ও প্রণবকে দিলাম। সংবাদটা শুনেই তারা দুজনে মূর্ছা গিয়েছে। এখন কী করি বলতো বাবা? তুমি কি একজন ডাক্তার ডেকে দিতে পারবে? আমি বললাম, মাসিমা ডাক্তার এই রোগ সারাতে পারবে না। আমি বরং অধীর চৌধুরী ও সোমেন মিত্রকে খবর দিচ্ছি। তারা এসে যদি ঝাঁড়ফুঁক করে মলয় ও প্রণবের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারে।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

শাহিনবাগ প্রসঙ্গ

দিল্লির শাহিনবাগে হত্যা ও ধ্বংসলীলা কেন? মনকে প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে তুলছে দুঃখের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি বিরোধিতায় ট্রেন-বাস পুড়ে ধ্বংসলীলার মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। একই ভাবে দিল্লিতেও কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হলো না। কারণ উভয়ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায়। ক্ষমতাসীন সরকারের মদত ছিল এটাই প্রমাণ। কারণ পুলিশ দপ্তর পরিচালনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

দিল্লি পুলিশ শাহিনবাগের আন্দোলনকে মদত জুগিয়ে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেনি। তথ্য প্রকাশ হাইকোর্টের সুপ্রিমকোর্টের। এর জন্য দিল্লি সরকার দায়ী হবে না কেন?

উল্লেখ্য, রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত। জনগণের নিরপত্তা ও সকল দায়িত্ব রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনো দেশ বিরোধী শক্তি যদি ক্ষমতাসীন সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে কেনো গণতান্ত্রিক দল বা কয়েকটি জোটবদ্ধ দল গণতন্ত্রিক অধিকারের নামে দেশ খণ্ড খণ্ড বা ধ্বংস করতে স্লেগান দেয়, সে দল বা দলগুলিকে শাহিনবাগে প্রায় তিন মাস যাবৎ জমায়েতের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন।

আমরা যদি অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখি— দেখব সেভাবে মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা দেশ ভাগ ও কমিউনিস্টরা দাবি তুলেছিল পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে। সেই ইতিহাসের চিত্রটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এরা দেশকে আরও ভাগ, আরও খণ্ড খণ্ড করতে চাইছে। এদের হিংসা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড গান্ধীজীর অহিংস দর্শনকে হত্যা করেছে। আজও ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতিকে আঘাত হানছে।

অন্যদিকে কংগ্রেসের অদূরদর্শিতা অতীতেও যেমন মানুষের শুধু সমস্যাই সৃষ্টি করেছে মানুষের কোনো সমাধান দেখাতে পারেনি, আজও পারছে না। বরং সমস্যার সৃষ্টি করছে। শাহিনবাগেও সেটাই ফুটে উঠছে। তাই দেশকে ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভারতীয় দর্শনকে, সুমহান ভারতকে রক্ষা করতে ব্রতী হওয়ার আহ্বান করছে 'ভারতমাতা'।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবের হাট, রাশিভাঙা,
কোচবিহার।

করোনায় অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হলে ট্রাম্প গদি হারাতে পারেন

ডেমক্র্যাটরা আশা করছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হলে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি শেষ হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে তাঁরা এখন তো বাইডেনের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। বার্নি স্যান্ডার্সকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বাইডেনকে সমর্থন দিয়ে প্রেসিডেন্ট রেস থেকে সরে দাঁড়াতে। মঙ্গলবার ১৭ মার্চ তিনটি স্টেটে প্রাইমারিতে বাইডেন জয়ী হয়েছেন। স্যান্ডার্স ক্যাম্পেনই

পুরো বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনা করছেন। গত ১৭ মার্চ ৪টি স্টেটে প্রাইমারি হওয়ার কথা ছিল। ৩টিতে হয়েছে। ওহাইওতে হয়নি। কারণ গভর্নর এক্সিকিটিভ নির্দেশ দিয়ে বন্ধ করেছেন। এর আগে আদালত করোনার জন্যে প্রাইমারি হবার পক্ষে নির্দেশ দিয়েছিল। ফ্লোরিডা, ইলিনয়েস, আরিজোনায় নির্বাচন হয়েছে। জেচা বাইডেন তিনটিতে জয়ী হয়েছেন। এই জয় তাকে আরও সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। পূর্ববর্তী নির্বাচনে স্যান্ডার্স ক্যালিফোর্নিয়া জিতেছেন। বাইডেন জিতেছেন ওয়াশিংটন।

বাইডেন তার নির্বাচনী ক্যাম্পেইন ঢেলে সাজাচ্ছেন, লক্ষ্য নভেম্বরে ট্রাম্পকে হারানো। তিনি ওবামার ক্যাম্পেইন কর্মকর্তা জেন ও'মেইলি ডিলনকে নিয়োগ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প করোনার জন্যে জরুরি অবস্থা জারি করে ২০০৯-এ 'সোয়াইন ফ্লু' নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্যে ওবামা এবং বিশেষ করে জো বইডেনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। জর্জিয়া ২৪ মার্চ অনুষ্ঠেয় প্রাইমারি স্থগিত করেছে, পরবর্তী দিন স্থির করেছে ১৯ মে ২০২০।

বাইডেন সিক্রেট সার্ভিস প্রটেকশন পেতে শুরু করেছেন। তুলসী গ্যাবার্ড এখনো প্রেসিডেন্সিয়াল রেসে আছেন। ট্রাম্প প্রশাসন করোনার কারণে ট্রাভেল ব্যান বাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও আয়ারল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গত ১৮ মার্চ ২০২০ বাইডেনের ডেলিগেট সংখ্যা ছিল ১১৮০, স্যান্ডার্সের ৮৮৫, ব্যবধান প্রায় ৩০০। স্যান্ডার্স কি এই ব্যবধান কমাতে পারবেন? দলীয় মনোনয়ন পেতে ১৯৯১টি ডেলিগেট প্রয়োজন।

বাইডেন-স্যান্ডার্স প্রথম সরাসরি বিতর্ক হয়েছে রোববার, ১৫ মার্চ বাইডেন ভালো বলেছেন। করোনার কারণে বিতর্ক ফিনিস্কের পরিবর্তে ওয়াশিংটনে হয়েছে। দর্শক ছিল না। বাইডেন বলেছেন, তিনি একজন মহিলাকে তাঁর রানিংমেট করবেন। স্যান্ডার্স ততটা জোর দেননি, বলেছেন, তিনিও হয়তো তাই করবেন। বিতর্ক শুরু হয় করোনা নিয়ে, সোশ্যাল সিকিউরিটি, মেডিকেয়ার, সবই আসে। বাইডেন চেষ্টা করেছেন, বামদের কাছে টানতে, যা ২০১৬-তে হিলারি পারেননি।

বাইডেন বলেছেন, জিতলে তিনি প্রথম তিন মাসে কাউকে ডিপোর্ট করবেন না। তবে বাইডেনের একটি কথার উত্তর দিতে ট্রাম্প দেরি করেননি। বাইডেন বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হয়তো সোশ্যাল সিকিউরিটি ও মেডিকেয়ারে কাটছাট করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক টুইটে এর উত্তরে বলেছেন, বাইডেন মিথ্যাবাদী, আমি নই বরং বইডেন জিতলে সোশ্যাল সিকিউরিটি ও মেডিকেয়ারে কাটছাট করবেন। বাইডেন বলেছেন তিনি একজন মহিলা রানিংমেট নেবেন, কে তিনি?

এই তালিকায় ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর কমল হ্যারিস, মিনেসোটার সিনেটর এমি ক্লোবুচার; অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত মিশিগান গভর্নর গ্রেটচেন হুইটমার; সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন প্রথম সরিতে আছেন। তারপর আছেন উদীয়মান ডেমক্র্যাট স্টেসি আব্রাহাম। নেভাদার সিনেটর ক্যাথরিন কর্টেজ ম্যাস্টো, রোড- আল্যান্ডের গভর্নর জিনা রাইমান্ডো, নিউ-মেক্সিকোর গভর্নর মিশেল লুজান গ্রিশাম, ইলিনয়েসের সিনেটর টামি ডাকওয়ার্থ; উইসকনসিনের টামি বোল্ডউইন, নিউইয়র্কের সিনেটর ক্রিস্টিন জিলিব্র্যান্ড এবং ফ্লোরিডার কংগ্রেসওমেন ভ্যাল ডেমিংস।

সামাজিক মাধ্যমে আরও একটি থিওরি আছে যে, বাইডেন রানিংমেট হিসাবে হিলারি ক্লিন্টনকে নেবেন, যাতে তিনি সহজে ট্রাম্পকে হারাতে পরেন। জয়ী হলে হিলারি ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবেন। বাইডেন ৭৮, তবে বয়সের কারণে ন্যুব্জ। হয়তো তিনি মারা যাবেন বা স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করবেন। হিলরি হবেন প্রেসিডেন্ট? আমার ধারণা, বাইডেন এ ভুল করবেন না। কেউ কেউ তার রানিংমেট হিসাবে ওবামা পত্নী মিশেলের নাম আনছেন, বোধকরি সেটিও হচ্ছে না। বাইডেনের নমিনেশন চূড়ান্ত হলে, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার জন্যে মাঠে নামবেন।

—শিতাংশু গুহ,
নিউইয়র্ক।

বুদ্ধিজীবীদের মহিমা বোঝা ভার

পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে সে দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকরা বিশেষ করে হিন্দুরা ক্রমাগত অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন, নিপীড়নের শিকার হয়ে চলেছে। হিন্দু পুরোহিত, মোহন্ত, সাধুসন্ন্যাসীরা তো বটেই সাধারণ ছাপোষা হিন্দুরা পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না জেহাদি মুসলমানদের হাত থেকে। পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া, দেবোত্তর সম্পত্তি, শ্মশানঘাটের দখল নেওয়া, হিন্দুকন্যা অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ নিয়মিতভাবে ঘটে চলেছে। কিন্তু এসব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিকদের কোনও মাথাব্যথা নেই। তবে তারা বড়োই ব্যথিত, দুঃখিত, মর্মাহত সাম্প্রতিককালে ঘটা দিল্লির ঘটনাবলীতে। তারা কলকাতার বিভিন্ন স্থানে মিটিং করছেন, রাস্তা অবরোধ করছেন, মিছিল করছেন, কিন্তু একবারও বলছেন না দিল্লির ঘটনাবলীর সূত্রপাত ঘটল কীভাবে? কারাই বা ঘটাল? দিল্লির ঘটনাবলীতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদের ভাই বেরাদররা। তাই এনাদের এত মর্মবেদনা। আইবি অফিসার অঙ্কিত শর্মাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে যে নৃশংসভাবে হত্যা করে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হলো বা হেড কনস্টেবল রতনলালকে যে জীবন দিতে হলো সে ব্যাপারে এদের কোনও বক্তব্য নেই। আম আদমি পার্টির কাউন্সিলর তাহির হুসেনের বিরুদ্ধেও কোনও কথা শোনা গেল না। এদের রোষানল শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের হিন্দুরা যে প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, মন্দির অপবিত্র করা হচ্ছে দেবোত্তর সম্পত্তি, শ্মশানঘাট প্রভৃতির দখল নেওয়া, হিন্দুকন্যা অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তরিত করা অহরহ ঘটেই চলেছে। এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে কোনও প্রতিবাদ, মিছিল, সভা, সমাবেশ কিছুই হয় না।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়োবাজার, চন্দননগর।

কলকাতা কল্যাণ ভবনে সেলাই প্রশিক্ষণ শিবির

পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কলকাতার মহিলা সমিতির উদ্যোগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ মার্চ কলকাতার কল্যাণ ভবনে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলার ১৫ জন বনবাসী যুবককে হাতে-কলমে সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে যুবকদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক রাজেন্দ্র মাদালা ও ক্ষেত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রমুখ মহাদেব গড়াই।

বীর প্রশান্ত মণ্ডলের বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুরারীপুর শাখায় উদ্‌যাপিত হলো বীর প্রশান্ত মণ্ডলের বলিদান দিবস। এই উপলক্ষ্যে সকালে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ২৩ জন রক্ত দান করেন। বিকেলে স্বয়ংসেবক ও নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাতে ১০ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের মা সহ সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত চেতনা মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক গণেশ পাল। স্বর্গীয় প্রশান্ত মণ্ডলের স্মৃতিচারণ করেন উদয় প্রামাণিক ও ধীরেশ তালুকদার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অলোক মুস্তাফি।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন

বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা গত ১৫ মার্চ সিউড়ী সংলগ্ন কড়িধ্যায় প্রবীণ আইনজীবী, লেখক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষচন্দ্র দত্তকে ১২৩ তম শ্রদ্ধা নিবেদন করে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন বিশিষ্ট শিক্ষক অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। মাল্যদানে ভূষিত করেন মহাদেব মুখোপাধ্যায়। পূজা করেন শ্রীদত্তের বউমা শিউলি দত্ত। তাঁর আরতি করেন তুলসী চক্রবর্তী ও কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। উত্তরীয়, বস্ত্র, ফল, মিষ্টি, গীতা মানপত্র দিয়ে ভূষিত করেন আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা ও দামোদর ঘোষাল। সংগীত পরিবেশন করে অর্পণ, সুনেত্রা, সৃজশী ও কবিতা। বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক-সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

ঈশ্বরপুরে পরিবার প্রবোধনের আলোচনা সভা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ঈশ্বরপুর জেলার ঈশ্বরপুর নগরের গোবিন্দ মন্দিরে গত ১৮ মার্চ পরিবার প্রবোধনের এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ২৫ জন মা-সহ ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ মুটুকেশ্বর পাল।। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের জেলা কার্যবাহ পরিমল সরকার, জেলা সংযোজক অভিষেক বণিক প্রমুখ।

ভুল সংশোধন : গত ১৬ মার্চ সংখ্যায় ভুলবশত শ্রী অজয় নন্দী মহাশয়কে বার কাউন্সিলের সদস্য লেখা হয়েছে। শ্রী নন্দী বার কাউন্সিলেন সদস্য নন। সমীর পাল বার কাউন্সিলের সদস্য।

শ্রীরামকথা শত শত বছর ধরে ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনাকে উজ্জীবিত রেখেছে

অমিত ঘোষ দস্তিদার

বাল্মীকি রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, স্বামী বেদানন্দ রচিত গুরুমুখী রামায়ণ থেকে আমরা জানতে পারি— আদি পুরুষ নিরঞ্জন। নিরঞ্জনের পুত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কন্যা ভানু। জমদগ্নির সঙ্গে ভানুর বিবাহ হয়। জমদগ্নির পুত্র মরীচ, মরীচের পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র সূর্য। সূর্যের পুত্র মনু। মনু থেকে সূর্য বংশের উৎপত্তি। সেই সময় সূর্যবংশের রাজ্যের নাম ছিল উত্তর কোশল। উত্তর কোশল রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল অযোধ্যা। সরযূ নদীর তীরে সূর্যপুত্র মনু অযোধ্যানগরী নির্মাণ করেন। মনুর পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতা প্রবল পরাক্রমী দিগ্‌বিজয়ী রাজা ছিলেন। মান্ধাতার পুত্র মুচকুন্দ। মুচকুন্দের পুত্র পৃথু। পৃথুর পুত্র শতাবর্ত। শতাবর্তর পুত্র আর্যাবর্ত। আর্যাবর্ত সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হন। এজন্য উত্তর ভারতের নাম আর্যাবর্ত। আর্যাবর্তের পুত্র ভরত। ভরত সমগ্রভূমির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে এই ভূভাগের নাম ভারতবর্ষ।

ভরতের পুত্র ভূধর। ভূধরের পুত্র খাণ্ড। খাণ্ডের পুত্র দণ্ড। দণ্ডের নামে তাঁর জন্মস্থানের নাম দণ্ডকারণ্য হয়েছিল। দণ্ড

পরম্পরা

শুক্রাচার্যের কন্যা অরজাকে বলপূর্বক বিবাহ করেছিলেন। শুক্রাচার্যের অভিশাপে দণ্ডের অকাল মৃত্যু হয়। দণ্ডের ঔরসে অরজার গর্ভে হারীত নামে এক পুত্র জন্মে। বালক হারীতকে মহর্ষি বশিষ্ঠ অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। হারীতের পুত্র হরিবীজ। হরিবীজের পুত্র বিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করেন এবং অদ্বিতীয় দাতা বলে খ্যাত হন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব। রোহিতাশ্বের পুত্র সগর। সগর শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। মহর্ষি কপিলের শাপে একজন পুত্র ছাড়া সকলে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। জীবিত ওই একজন পুত্রের নাম অসমঞ্জ। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথই স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে এনে সগর বংশের উদ্ধার করেন। ভগীরথের পুত্র সৌদাস। সৌদাসের অন্য নাম কল্মাষপাদ। সৌদাসের পুত্রের নাম সুদাম। সুদামের পুত্রের নাম দিলীপ। দিলীপের পুত্র ছিলেন রঘু। রঘু ছিলেন স্বর্গ মর্ত্য বিজয়ী বীর এবং অতুলনীয় দাতা। তাঁর কীর্তিপ্রভাবে সূর্যবংশ রঘুবংশ নামে পরিচিত হয়। রঘুর পুত্র অজ। অজ-র পুত্রই হলেন মহারাজ

দশরথ। দশরথের তিন রানির (কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা) গর্ভে নারায়ণ চার অংশে (রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন) জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বামিত্র :

বিশ্বামিত্র জীবনের প্রথম ভাগে ছিলেন রাজা। পরে তিনি তপস্যা করে বহু দিব্যাস্ত্র লাভ করেন। তিনি ছিলেন মহাতপঃ শক্তিশালী ত্রিকালজ্ঞ। তিনি রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন যে নারায়ণের চার অংশ তা জানতেন এবং নারায়ণের অবতার রূপে রামচন্দ্র রাক্ষসকুল বিনাশ করে ধর্মরাষ্ট্র গঠনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন তাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন।

তারকা :

সুকেতু নামে এক যক্ষ ব্রহ্মার ধ্যান করে কন্যারূপে তারকাকে লাভ করেন। ব্রহ্মার বরে তারকা সহস্র মত্ত হস্তীর বল লাভ করে। জম্ভাসুরের পুত্র সুন্দের সঙ্গে তারকার বিবাহ হয়েছিল। তারকা ও সুন্দের পুত্রের নাম মারীচ। অগস্ত্যঋষির অভিশাপে তারকা ও মারীচ রাক্ষসে পরিণত হয়। তারকা যেখানে থাকত সেখানে মলদ ও কারুষ নামে দুটি জনপদ ছিল। তারকা রাক্ষসে পরিণত হবার পর ওই নগর দুটি ধ্বংস করে। এর ফলে তা পুনরায় অরণ্যে পরিণত হয়। তখন সেই স্থানের নাম হয়ে যায় তারকার অরণ্য।

তারকা বধ :

হিন্দুশাস্ত্রে নারীহত্যা মহাপাতক বলে কথিত আছে। রামচন্দ্র তারকাকে হত্যা বা বধ করেন। কিন্তু রাম সেই বধের কারণে মহাপাতক হননি। তার কারণ, মনুস্মৃতিতে কথিত আছে—

''আততায়িনমায়ন্তং হন্যাদেবাবিচারয়ণ্।''

—উদ্যত আততায়ীকে বিনা বিচারে হত্যা করা উচিত। তারকা ছিল শতসহস্র নর-নারীর হত্যাকারিণী। সমাজে নিরাপত্তা এবং শান্তি স্থাপনের জন্য তারকাকে বধের প্রয়োজন ছিল। তাই রামচন্দ্র তারকাকে বধ করে মহাপাতক হননি।

হরধনু :

এক মতে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার সময় আবার অন্য মতে ত্রিপুরাসুর বধের সময় মহাদেব যে ধনু ব্যবহার করেছিলেন, পরে সেই ধনু দেবতাদের কাছে থাকে। দেবতারা সেই ধনু জনকরাজার পূর্বপুরুষ দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রেখেছিলেন। অন্য মতে পরশুরাম তাঁর গুরু মহাদেবের নিকট এই ধনু পেয়েছিলেন। তিনি জনককে এই ধনু দেন এবং তিনিই নির্দেশ দেন এই ধনুকে যে গুণ পরাতে পারবে তাঁর সঙ্গেই যেন সীতার বিবাহ দেওয়া হয়। মহাদেবের আর এক নাম 'হর'। তাই এই ধনুর নাম হরধনু।

জনক :

ধর্মাত্মা রাজা নিমির পুত্র মিথি; মিথির পুত্র প্রথমজনক। তার তিন পুরুষ পর দেবরাত। দেবরাতের চৌদ্দপুরুষ পরে হ্রস্বরোমা। হ্রস্বরোমার দুই পুত্র— সীরধ্বজ এবং কুশধ্বজ। সীরধ্বজই হলেন সীতার পিতা জনক।

সীতা :

দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কুশধ্বজের একটি কন্যা ছিলেন। সেই কন্যার নাম বেদবতী। পিতার ইচ্ছা ছিল বিষ্ণুর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন। কিন্তু তৎপূর্বেই কুশধ্বজ শুম্ভ দৈত্যের হস্তে নিহত হলেন, তাঁর সাধ্বী পত্নীও পতির সহমৃতা হন। তখন বেদবতী নারায়ণকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করতে গেলেন। দুর্মতি রাবণ তাঁকে নির্জনে একাকিনী দেখে হরণ করার উদ্দেশ্যে কেশধারণ করেন। বেদবতী দ্রুত কেশপাশ ছেদন করে রাবণের হাত থেকে মুক্ত হয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করলেন। রাবণকে বেদবতী বলেছিলেন— ''তোর ধ্বংসের জন্য আমি পুনরায় কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব।'' অগস্ত্যঋষি রামকে বলেছিলেন— সেই বেদবতীই সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল— রাজারা স্বহস্তে যজ্ঞভূমি কর্ষণ ও শোধন করবেন। একদা রাজা জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করছিলেন। ভূমি কর্ষণের সময়ে লাঙ্গলের ফালার দ্বারা জমিতে যে রেখা অঙ্কিত হয়ে যায় তার নাম সীতা।

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রংলাঙ্গলা দুহিতা ততঃ।। —আদি ৬৬।১৩
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুহিতা সাতু ব্যবর্ধত সমাত্মজা।। —আদি ৬৬।১৪

যজ্ঞভূমি কর্ষণকলে সীতার মধ্যে আকস্মিকভাবে কন্যাকে পেয়ে জনক ঔরসজাত কন্যাপেক্ষা তাঁকে স্নেহযত্নে লালন পালন করেন। সীতার মধ্যে প্রাপ্ত বলে কন্যাটির নাম রাখেন সীতা। ভূমি হতে উৎপন্ন বা প্রাপ্ত বলে সীতাকে বলা হয় পৃথিবীকন্যা। বিদেহ রাজ্যের কন্যা বলে তাঁর নাম বৈদেহী। জনকের কন্যা, এজন্য তাঁকে জানকীও বলা হয়।

বিবাহ :

মিথিলার রাজা জনকের পালিতা কন্যা সীতার সঙ্গে রামের; জনকের ঔরসজাত কন্যা ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের; জনকের আপনভাই কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবীর সঙ্গে ভরতের এবং শ্রুতকীর্তির সঙ্গে শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়।

সম্পাতি ও জটায়ু :

কশ্যপের পত্নী বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড়ের জন্ম হয়। অরুণের দুই পুত্র— সম্পাতি ও জটায়ু।

হনুমান :

পুঞ্জিকাস্থলী নামে এক অপ্সরা ঋষি শাপে যূথপতি কুঞ্জরের কন্যা অঞ্জনা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বানররাজ কেশরীর সঙ্গে অঞ্জনার বিবাহ হয়। বায়ুদেবতার বরে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়। বায়ুকে মরুৎ বা পবন বলা হয়। তাই হনুমানের নাম মারুতি বা পবননন্দন।

রাবণ :

রাবণকে বলা হয় দশানন। রাবণ ছিলেন বিরাট পণ্ডিত। বহুবিধ, বহুমুখী শক্তি, প্রতিভা এবং জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যুদ্ধেও ছিলেন পারদর্শী।

রাক্ষসাধিপতি মাল্যবানের আদেশে তাঁর কন্যা নিকষা বা কৈকসী বিশ্রবা মুনিকে পতিরূপে বরণ করেন। কৈকসীর গর্ভে তিন পুত্র— রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই কঠোর তপস্যা করলে ব্রহ্মা তুষ্ট হন। রাবণ ব্রহ্মার কাছে অমরত্ব চাইলেন। ব্রহ্মা রাবণকে অমরত্ব বাদে অন্য বর চাইতে বললেন। রাবণ স্বর্গ, মর্ত্য ও

পাতালের সব জীবের নাম উল্লেখ করলেন (কিন্তু সেই নামের তালিকায় নর ও বানরের নাম উল্লেখ করেননি)— তাদের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে না, এই বর চাইলেন। ব্রহ্মা তথাস্তু বললেন। কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রা এবং একদিন জাগরণ এবং ওই জাগরণের দিন অজেয় হবার বর চাইলেন। ব্রহ্মা শর্ত-সহ বর দিলেন। শর্ত ছিল— অকালে নিদ্রা ভঙ্গ হলে মৃত্যু হবে। বিভীষণকে ব্রহ্মা অমরত্ব বর দেন।

মাল্যবান্ যখন সংবাদ পেলেন যে তাঁর দৌহিত্রেরা বর পেয়ে অজেয় হয়েছে, তখন তিনি তাদের আদেশ দিলেন— কুবেরকে পরাজিত করে লঙ্কা অধিকার করার। রাবণ কুবেরকে পরাজিত করে লঙ্কা ও পুষ্পকবিমান অধিকার করলেন। কুবেরকে পরাজিত করার পর রাবণ পুষ্পকবিমান নিয়ে হিমালয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর পুষ্পকরথ অকস্মাৎ অচল হয়ে গেল। নন্দী তাকে ফিরে যেতে বলল। রাবণ নন্দীকে অপমান করলেন। নন্দী রাবণকে অভিশাপ দিলেন যে বানরের দ্বারাই রাবণের সাম্রাজ্য এবং বংশ ধ্বংস হবে। রাবণ তাচ্ছিল্য করলেন এবং শিবের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে কৈলাশকে ধারণ করে উঠাতে চেষ্টা করলেন। শিব তাঁর পায়ের আঙুলের চাপ দিয়ে রাখলেন। যে চাপে রবণের হাত চাপা পড়ে যাওয়ায় সে আর্তরবে শিবের স্তব জপ করতে লগল। নীলকণ্ঠ তুষ্ট হয়ে রাবণকে মুক্তি দেন। ভীষণ 'রব' করে আর্তনাদ করেছিলেন বলে সেদিন থেকে দশাননের নাম হলো রাবণ।

বালিবধ :

বালিবধ ছিল অত্যাচার, ব্যাভিচার থেকে সমাজকে রক্ষা করা। রামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রিয় তাই রাজ্য-ধর্ম ইত্যাদিকে রক্ষা করা ছিল তাঁর পরম কর্তব্য। তিনি শুধু বালীকে বধ করতে চেয়েছিলেন। সামনাসামনি লড়াই করলে অযথা সৈন্য ক্ষয় হতো, তাই রামচন্দ্র গোপনে বালীকে বধ করেন, যা ছিল ক্ষাত্রধর্মের অন্যতম কৌশল।

রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা :

পুরাণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম কর্তৃক দুর্গাপূজার কথা আছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে নেই। বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে তিনি আদিত্যহৃদয় স্তোত্র দ্বারা সূর্যের উপাসনা করেছিলেন।

শূদ্রতপস্বী শম্বূক বধ :

রামচন্দ্র কখনই শূদ্র বিদ্বেষী ছিলেন না। কারণ নিষাদরাজ গুহককে মিত্র বলে গ্রহণ করে তাঁর উচ্ছিষ্ট ফল সাদরে খেয়েছিলেন। যিনি ব্যাধকন্যা শবরীকে সস্নেহে আশীর্বাদ করে তার প্রদত্ত ফলসমূহ খেয়েছিলেন, যিনি বানর, ভল্লুকগণের সঙ্গে বাস ও ভোজন করতেন, রাজ্যাভিষেক উৎসবে ও অশ্বমেধ যজ্ঞে যিনি বানরগণের উপর ভার দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণগণের আহার্য পরিবেশনের। সেই রামচন্দ্র যে শূদ্রকে ঘৃণা করতেন বা তাঁর রাজ্যে শূদ্রের কোনও প্রকার অসম্মান ছিল— একথা নিতান্ত অভিসন্ধি পরায়ণ লোক ভিন্ন কেউ বলতে পারে না। শম্বুকের তপস্যার অন্তরালে নিশ্চয়ই অনুল্লিখিত গুরুতর সমাজ বা রাষ্ট্রের অনিষ্টকর কার্যকলাপের অভিসন্ধি ছিল, যার জন্য রামচন্দ্র তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। মনে রাখতে হবে, রাবণ ও কুম্ভকর্ণও তপস্যা করেছিলেন।

লক্ষ্মণের রাম কর্তৃক বিসর্জিত এবং দেহত্যাগ :

মহর্ষি অতিবলের দূত মহর্ষি কাল রামের সঙ্গে গোপনে আলাপ করতে চেয়ে নিয়ম করলেন যে, তাঁদের আলাপনের কালে যদি কেউ তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে সে বধ্য হবে। রাম সম্মত হয়ে লক্ষ্মণকে দ্বারে রাখলেন। এমন সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা এসে রামের দর্শন চাইলেন। লক্ষ্মণ অপেক্ষা করতে বলায় ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্বাসা বললেন— অবিলম্বে রামকে সংবাদ দাও, নতুবা আমি তোমাদের সকলকে অভিশাপ দেব। লক্ষ্মণ অগত্যা সকলকে অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে বিপন্ন করে রামের নিকট সংবাদ দিলেন। দুর্বাসা বহুকাল উপবাসের পর ভোজন করতে চাইলেন। রাম ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। দুর্বাসা ভোজন শেষ করে তৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন।

গুরু বশিষ্ঠকে ডেকে রাম লক্ষ্মণের সম্পর্কে কর্তব্য জানতে চাইলেন। বশিষ্ঠ বললেন— ''প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করলে ধর্ম লোপ হবে। তুমি লক্ষ্মণকে ত্যাগ করো।''

রাম বললেন—

''বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মাভূদ্ধর্ম বিপর্যয়ঃ।
ত্যাগোবধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যুভয়ং সমম্॥

—উত্তর ১০৬।১৩

''লক্ষ্মণ! তোমাকে বিসর্জন দিলাম। ধর্মের বিপর্যয় না হয়। প্রিয়জন কর্তৃক ত্যাগ বহা মৃত্যু সাধুজনের পক্ষে দুই-ই সমান।'' রাম কর্তৃক বিসর্জিত, রামগত প্রাণ লক্ষ্মণ সরযূতীরে গমন পূর্বক যোগসমাহিত হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

রামের বিষ্ণুলোক যাত্রা :

লক্ষ্মণের দেহত্যাগের পর কুশকে দক্ষিণ কোশলের এবং লবকে উত্তর কোশলের সিংহাসনে অভিষেক করলেন। বিন্ধ্যপর্বতের পার্শ্বস্থ কুশাবতীনগরীতে কুশ ও শ্রাবস্তীপুরে লবের অভিষেক কার্য সুসম্পন্ন হলো। শত্রুঘ্নর দুই পুত্র— সুবাহুকে মথুরা এবং শত্রুঘাতীকে বৈদিশপুরীর রাজপদে অভিষিক্ত করা হলো। অতঃপর রাম, ভরত, শত্রুঘ্ন, স্ত্রীগণ, সুগ্রীবাদি বানর ও ভল্লুকগণকে সঙ্গে নিয়ে সরযূ নদীতে আত্মনিমজ্জন পূর্বক বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করলেন। বানর ও ভল্লুকগণ যে যে দেবতার অংশে জন্মেছিলেন সেই সেই দেবতায় প্রবেশ করলেন। সুগ্রীব সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করলেন।

রাম :

রাম নাম জপ ও লীলা ধ্যান করে লক্ষ লক্ষ ভক্ত, সাধক, তপস্বী মহাপুরুষ জীবনে পরম ও চরম মুক্তিলাভ করে জগৎকে আলোকিত করে গেছেন। তাঁর আদর্শ চরিত্র ও মহত্ত্ব স্মরণ, মনন, আলোচনা ও অনুসরণ করে একটা বিরাট জাতি, সমাজ, সংস্কৃতি— সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে শতসহস্রাব্দ যাবৎ টিকে আছে।

তাঁর চরিত্র মহিমা ও লীলা কাহিনি পুরাণে, ইতিহাসে, কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, কর্মে, আচরণে, চিন্তায়, ভাবনায়, কল্পনায়, স্মরণে, বচনে, আলোচনায় সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার পূর্বক বিরাট জাতীয় চেতনাকে শত শত যুগ ধরে আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট করে রেখেছে।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road. Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর

BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

করোনা মোকাবিলায় সেই ব্রিটিশ আইনই ভরসা

ধর্মানন্দ দেব

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরু চীন থেকে। ২০১৯ সালের ১ ডিসেম্বর। হুবেই প্রদেশের উহান শহর। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ চীনের দেশীয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আউট ব্রেক ঘোষণা করে। ৩০ জানুয়ারি গ্লোবাল পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সি ঘোষণা করে। গত ২০২০ সালের ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) করোনাকে বিশ্বব্যাপী 'মহামারী' হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং করোনার নামকরণ করেছে কোভিড-১৯। কো হলো করোনা, ভি হলো ভাইরাস এবং ডি হলো রোগ। ২০১৯ সালে রোগটি ধরা পড়ে তাই নামকরণ হয় কোভিড-১৯। এই মারণ ব্যাধি ছড়িয়ে গিয়েছে ১৬০টির মতো দেশে। মৃতের সংখ্যা ছাপিয়ে গিয়েছে দশ হাজারের বেশি। আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। ভারতে এই সংক্রমণ রুখতে সেই ব্রিটিশ জমনার আইনই ভরসা। ১৮৯৬ লালে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে অধুনা মুম্বাইতে প্লেগের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ভারতে ১৮৯৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তৈরি করা হয়েছিল 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট' বা মহামারি প্রতিরোধ আইন। এই আইনের প্রভাবে সরকার বিভিন্ন বাড়িতে, যাত্রীদের মধ্যে সন্দেহজনক প্লেগের রোগী খুঁজে বের করত। সংক্রামিতদের জোর করে আলাদা করে রাখা হতো। ধ্বংস করে দেওয়া হতো সংক্রমিত এলাকাগুলি। এই আইনে চারটি ধারা রয়েছে। আইনের প্রথমেই স্পষ্ট বলা হয়েছে— "An Act to provide for the better prevention of the spread of Dangerous Epidemic Diseases" কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই এই আইন প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। আইনের দ্বিতীয় ধারায় রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিধি তৈরির অধিকার দেওয়া হয়েছে। আইনে আরও বলা হয়েছে—

(১) যখনই কোনও রাজ্য সরকার মনে করবে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং বর্তমান আইনে তা রোধ করা সম্ভব নয়, তখন সরকার নিজে বা কোনও ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে অধিকার দিতে পারে। সেজন্য প্রয়োজনীয় নোটিস জারি করতে পারে। (২) ট্রেন বা অন্য কোনও পরিবহণে যাতায়াতকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যেতে পারে। এর জন্য কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই। (৩) স্বাস্থ্যপরীক্ষকদের সন্দেহ হলে সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আলাদা করে হাসপাতাল বা অন্য কোনও অস্থায়ী জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (৪) এই আইন অমান্য করলে শাস্তির বিধান রয়েছে। এমনকী হতে পারে জেলও। উক্ত আইনের ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে স্পষ্ট এইরূপ :

"Any person disobeying any regulation or order made under this Act shall be deemed to have committed an offence punishable under Section 188 of the Indian Penal Code."

ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৮৮ নম্বর অনুচ্ছেদ বোধগম্য হওয়ার জন্য দুটি সহজ উদাহরণ তুলে ধরছি। মনে করুন, সেন্ট্রাল রোড দিয়ে মিছিল করে গিয়ে আপনি গণেশ পূজার মুর্তি বিসর্জন করবেন। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন এক নির্দেশ প্রদান করে আপনাকে মিছিল না করা কথা জানায়। তার পর আপনি স্থানীয় প্রশাসনের কথা অমান্য করে মিছিল করেন। তার জন্য সেন্ট্রাল রোডে এক দাঙ্গা হয়। সেক্ষেত্রে আপনি ১৮৮ নম্বর ধারায় দোষী হতে পারেন। এখন মনে করুন, আপনি সন্দেহজনক ভাবে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী, সেজন্য স্থানীয় প্রশাসন (স্বাস্থ্য বিভাগ) আপনাকে আইসোলেশন বা কোয়রান্টিন বা

"কেন্দ্র সরকার 'মাস্ক' ও 'স্যানিটাইজার' উভয় দ্রব্যকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসেবে ঘোষণা করেছে ১৯৫৫ সালের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আইনের আওতায়। মনে রাখা দরকার, এই আইনে অপরাধ সংঘটিত হলে সাত বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।"

হোম কোয়রান্টিনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আপনি নির্দেশ অমান্য করে লোকালয়ে ঘোরাফেরা করছেন। তারজন্য অন্যের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা রয়েছে বা অন্য ব্যক্তির মধ্যে এই করোনা ভাইরাস রোগ সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন আপনি এই ১৮৮ নম্বর ধারায় দোষী হতে পারেন এবং সাজাও হতে পারে। এই আইনের আওতায় জারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারের বিধিনিষেধ মেনে চলা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য। এই বাধা-নিষেধ অমান্য করলে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৮৮ নম্বর ধারা অনুসারে দু'মাস থেকে ছ'মাস পর্যন্ত কারাবাস এবং ২০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা জরিমানার সংস্থান রয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় দণ্ড বিধির ২৭০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ক্ষতিকারক রোগ সংক্রমণ ছড়ানোয় সহায়তা করা অপরাধ। এতে সর্বোচ্চ দু' বছরের সাজা হতে পারে।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের সতর্কতা হিসেবে আমরা তিনটি শব্দ ইদানীং প্রায়ই শুনে থাকি। শব্দগুলি হচ্ছে আইসোলেশন, কোয়রান্টিন ও হোম কোয়রান্টিন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কথায় এই তিনটি শব্দের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ওইসব চিকিৎসকদের মতে আইসোলেশন হচ্ছে করোনা আক্রান্ত রোগীকেই আইসোলেশনে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে ১৪ দিনের মেয়াদে আইসোলেশন চলে। সেই মেয়াদ প্রয়োজনে বাড়ানোও হতে পারে। সেই সময় রোগীর সঙ্গে পরিজন-সহ বাইরের কেউ যোগাযোগ করতে পারেন না। আবার কোয়রান্টিন হচ্ছে ওই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কথায় করোনা ভাইরাস রোগীর শরীরে সংক্রমিত হয়েছে কি না সেটা জানার জন্যই সন্দেহজনক রোগীকে কোয়রান্টিনে (অনদের থেকে পৃথক করে রাখা হয়) পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে ১৪ দিনের মেয়াদে কোয়রান্টিন পিরিয়ড চলে। এই সময় রোগীকে কোনো ওষুধপত্র দেওয়া হয় না, শুধু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা বলা হয়। এই সময় মাস্ক ব্যবহারের কথা বলা হয়। এই সময় হাসপাতালে রাখা হয় না। সরকার নিয়ন্ত্রিত কোয়রান্টিনে রাখা হয়। আর হোম কোয়রান্টিনও প্রায় কোয়রান্টিনের মতো, শুধু 'হোম কোয়রান্টিন' বাড়িতে হয় এবং 'কোয়ারান্টিন' সরকার নিয়ন্ত্রিত স্থানে হয়।

১৮৯৭ সালের 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট' বা মহামারী প্রতিরোধ আইনের ৪ নম্বর ধারায় এই আইন বলবৎকারী আধিকারীকদের আইনি সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এইরূপ— "No suit of other proceeding shall lie against any person for anything done or in good faith intended to be done under this Act."

স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে একাধিবার এই ১৮৯৭ সালের 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট' বা মহামারী প্রতিরোধ আইন কার্যকর করা হয়েছিল। ২০০৯ সালে মহারাষ্ট্রের পুনেতে 'সোয়াইন-ফ্লু' আটকাতে গোটা শহরের সমস্ত হাসপাতালগুলিকে পরীক্ষার জন্য উক্ত আইনের ২ নম্বর ধারা প্রয়োগ করা হয়। যদিও পরে সোয়াইন-ফ্লু রোগ বলে চিহ্নিত করা হয়। ২০১৫ সালে চণ্ডীগড়ে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর মোকাবিলায় ওই আইন প্রয়োগ করা হয়। আইন অনুসারে আধিকারিকদের নোটিশ জারি করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৫০০ টাকার চালান কাটতে। সম্প্রতি ২০১৮ সালে গুজরাটের বদোদরার জেলা কালেক্টর এই আইনের আওতায় নোটিফিকেশন জারি করে ওয়াগোড়িয়া তালুকের খেদকর্মাসিয়া গ্রামকে কলেরা অধ্যুষিত ঘোষণা করেন। তার আগে সেখানে ৩১ জনের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে সমগ্র দেশে ১৮৯৭ সালের মহামারী আইন বলবৎ করা হয়েছে। কর্ণাটক রাজ্য সরকার উক্ত আইনের ২ নম্বর ধারা অনুসারে গত ১১ মার্চ একটি রেগুলেশন বলবৎ করে কর্ণাটক রাজ্যে। ওই রেগুলেশনে 'Epidemic Disease'-র সংজ্ঞার ভিতরে 'কোভিড-১৯'-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে করোনার মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হাতে নেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। দেখতে হবে একজন নাগরিকও করোনা সংক্রমণের জেরে কোনও প্রকার বিদ্বেষের শিকার না হন এবং এই মওকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ওষুধপত্রের কালোবাজারির চেনা ব্যাধিটিও যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে— সেটাও সরকার ও স্থানীয় প্রসাসনকে নিশ্চিত করতে হবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্র সরকার 'মাস্ক' ও 'স্যানিটাইজার' উভয় দ্রব্যকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসেবে ঘোষণা করেছে ১৯৫৫ সালের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আইনের আওতায়। মনে রাখা দরকার, এই আইনে অপরাধ সংঘটিত হলে সাত বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। সে যাই হোক, 'কোভিড-১৯'-র সংক্রমণ প্রতিরোধ জনসচেতনতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমাদের জনস্বাস্থ্য কর্মীদের সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করা এই মুহূর্তে খুব দরকার। সেইসঙ্গে সরকারি কর্মীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া দরকার আমজনতার। প্রধানমন্ত্রীর জনতা কারফুর আবেদনে দেশবাসীকেও পূর্ণমাত্রায় সাড়া দিতে হবে।

(লেখক অসম নিবাসী বিশিষ্ট আইনজীবী)

সাবান না স্যানিটাইজার

- বেশিরভাগ মানুষ প্রতি ২ থেকে ৫ মিনিটে একবার মুখে হাত দেয়।
- সাবান দিয়ে বারবার হাত না ধুলে হাতে থাকা ভাইরাস মুখ এবং নাকের ছিদ্র দিয়ে শরীরের ভেতরে যাবার সুযোগ পায়।
- যেহেতু করোনা ভাইরাস আঠালো পদার্থ দিয়ে তৈরি তাই সহজেই হাতের চামড়ায় আটকে থাকে। শুধু জল দিয়ে হাত ধুলে হাত ভাইরাস-মুক্ত হয় না। সাবান দিয়ে হাত ধোয়া জরুরি।
- হাত ধোওয়ার জন্য সাবান অথবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করার কথা বলা হচ্ছে। এতে ধন্দে পড়েছেন প্রত্যন্ত গ্রাম ও মফস্সলের মানুষ। স্যানিটাইজার কী তারা জানেন না। তাদের প্রশ্ন স্যানিটাইজার দিয়েই কি হাত ধুতে হবে, নাকি সাবানেই চলবে? বিশেষজ্ঞদের জবাব : স্যানিটাইজার এক ধরনের অ্যালকোহল মিশ্রিত তরল পদার্থ। স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুলে হাত সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয়। কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া বাধ্যতামূলক নয়। সাবান দিয়ে হাত ধুলেই চলবে। হাত ধোবেন অন্তত কুড়ি সেকেন্ড ধরে আর জীবাণুনাশক সাবান।

চার কার্যকর্তার আত্মবলিদানে রঞ্জিত কাঞ্চনছড়া রতনমণি শিশুশিক্ষা নিকেতন

লক্ষ্মণ দেব

ত্রিপুরার চার আর এস এস কার্যকর্তার মর্মান্তিক অপহরণের ইতিহাস বড়োই বেদনাদায়ক। বর্তমান প্রজন্মের কাছে ১৯৯৯ সালের ৬ আগস্টের সেই অঘটন রহস্যই হয়ে রয়েছে। কী কারণে চারজন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবককে সঙ্ঘের কার্যকর্তাকে অপহরণ করে চিরতরে গুম করা হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কোনো তদন্তই করেননি বলে অভিযোগ। দায়সারাভাবে একটি মামলা দায়ের করে এই স্পর্শকাতর হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দিয়েছে তৎকালীন সিপিএম সরকার। সুচতুরভাবে উগ্রপন্থীদের উপর দায় চাপানো হয়েছে। গোটা রাজ্যে সেইসময় সিপিএমের হার্মাদরা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। তাদের তাণ্ডবে জনগণ ছিলেন নীরব দর্শক। কিন্তু ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সেই রহস্য সামনে আসতে শুরু করেছে।

(বাঁ দিক থেকে) শ্যামল সেনগুপ্ত, দীপেন দে, শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও সুধাময় দত্ত

গত ৮ মার্চ নিহত চারজন কার্যকর্তার বধ্যভূমি ধলাই জেলায় মনু ব্লকের কাঞ্চনছড়া রতনমণি শিশুশিক্ষা নিকেতনে পা রাখেন স্বস্তিকার ব্যবস্থাপক জয়রাম মণ্ডল, স্থানীয় প্রচারক কানু মালাকার। আলাপচারিতায় তাঁরা উল্লেখ করেন ১৯৯৯ সালের ৬ই আগস্ট সকাল এগারোটায় শুভঙ্কর চক্রবর্তী, সুধাময় দত্ত, দীনেন্দ্র নাথ দে, শ্যামল সেনগুপ্তকে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বন্দুক উঁচিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা। তখনকার কমবয়সি বিভাগ প্রচারক শুভঙ্কর চক্রবর্তী দুষ্কৃতীদের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। অস্ত্রের মুখে আশ্রমের প্রার্থনা সভাকক্ষ থেকে তুলে নিয়ে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায় তারা। সেই সময় ৫০ জনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী রতনমণি শিক্ষা নিকেতনের অভ্যন্তরেই ছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে বন্দুক উঁচিয়ে গ্রামের উপর দিয়ে নিয়ে যায় চার কার্যকর্তাকে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই অপহরণকাণ্ড সংঘটিত করা হয়। এমনকী মনু থানায় এই সংবাদ পৌঁছায় ২৪ ঘণ্টা পর। পুলিশ সব জেনেশুনে নীরব দর্শক ছিল। ১৯৯৯ সালের ৭ মার্চ মনু থানায় একটি এফ আই আর দায়ের করা হয়, নং Case No. 41/99 U/S-448/365/34 and 27 of arm's act's. । এই মামলা করার পর পুলিশ দায়সারাভাবে কাঞ্চনছড়া শিশুশিক্ষা নিকেতনের কাছাকাছি চিরুনি তল্লাশি করার নাটক করে। কিন্তু সত্যিকারের কোনো আসামি গ্রেপ্তার করেনি। এর বিরুদ্ধে মনু থানার সামনে দশদিন গণঅবস্থান সংঘটিত করে স্বয়ংসেবকরা। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে দশজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে ছিলেন ধনঞ্জয় মুণ্ডা, আনন্দ রিয়াং, খলেন্দ্ররাম রিয়াং, গণ ত্রিপুরাসহ অন্যান্য। এটি ছিল পুলিশের একটি সাজানো নাটক। এতবড়ো অপহরণের পর মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একটি দুঃখজনক বিবৃতি পর্যন্ত দেননি বলে। কোনো ম্যাজিসট্রেট পর্যায়ের অফিসারকে দিয়ে তদন্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। গ্রাম থেকে পাহাড়, নগর সর্বত্রই জল্লাদরূপী ক্যাডাররা দখল নিয়েছিল। চার কর্মকর্তার অপহরণস্থল রতনমণি শিশুশিক্ষা নিকেতন আজও সমানভাবে কাজ করে চলেছে, এক মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হয়নি। ১৯৮৯ সালে এই আশ্রমের সূচনা হয়। তখন আবাসিক বিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা কে কে সত্যমজী। ওই সময় ছাত্র ও ছাত্রী উভয় আবাসিক হস্টেল ছিল। এরপর হরিহর প্রসাদ এই আশ্রমের দায়িত্বভার নেন। সেই সময়ই এই অপহরণ কাণ্ড ঘটে। ভূমিপুত্রদের শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্য সি পি এমের এটি ছিল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। এই অপহরণ কাণ্ড তারই অঙ্গ রূপে চিহ্নিত। বৈরীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হরিহর প্রসাদ সঙ্ঘের কাজ চালিয়ে যান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। লালসন্ত্রাসের মোকাবিলা করেই কাঞ্চনছড়া আশ্রমে হরিহর প্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ ভীড়া, রাজেশ দাস, বর্তমানে সঞ্জিত পাল এই আবাসিক আশ্রমের দায়িত্ব পরিচালনা করছেন। এখনো ৫০-এর বেশি আবাসিক উপজাতি ছাত্র রয়েছে। তাদের পঠন পাঠনের দায়িত্ব নিয়ে সঙ্ঘ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। দীর্ঘ চার দশক উপজাতি ভূমিপুত্রদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সঙ্ঘ যে ভূমিকা নিয়েছে লালসন্ত্রাসের মুখে আত্মাহুতির পরও আবাসিক শিক্ষাঙ্গন রাজ্যের আটটি জেলায় চলছে। মানব কল্যাণে এই আত্মবলিদান কাঞ্চনছড়া রতনমণি শিশু শিক্ষা নিকেতন এক ঐতিহাসিক স্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ■

বহমান বাঙ্গালিয়ানার দুই বাহক

রূপশ্রী দত্ত

একসময় কমেডি বাংলা সিনেমাকে এক অপূর্ব সৌকর্যে উন্নীত করেছিল। সেই উৎকর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন দুই অভিনেতা। হরিধন মুখোপাধ্যায়, এবং তুলসী চক্রবর্তী।

হরিধন মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৭ সালের ৭ নভেম্বর। তাঁর আসল নাম দীনবন্ধু। তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে কাজ করতেন। অভিনেতা ছাড়াও তিনি ছিলেন অসাধারণ গায়ক। বিশেষত, তাঁর দক্ষতা ছিল উচ্চাঙ্গ সংগীতে। ভক্তিমূলক, আধ্যাত্মিক সংগীতও তিনি গাইতেন। লোকমুখে তিনি হরিধন নামেই পরিচিত ছিলেন এবং চলচ্চিত্রেও এই নামটিই ব্যবহার করতেন।

চলচ্চিত্র, সংগীত ও মঞ্চে অভিনয়ের জন্য তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। অন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউস, হীরক রাজার দেশে, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী ইত্যাদি ছবিতে তাঁর কৌতুক অভিনয় লোকের মন জয় করেছিল। সত্যজিৎ রায়ের পরিচলনায় তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘায় অভিনয় করেছিলেন। শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, ধন্যি মেয়ে, ফুলেশ্বরী ও মহাপুরুষ তাঁর অভিনীত ছবি। সত্যজিৎ রায় হরিধন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি যদি আমেরিকায় জন্মাতেন তাহলে নিশ্চয়ই অস্কার পুরস্কার পেতেন।

তুলসী চক্রবর্তী ১৮৯৯ সালের ৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আশুতোষ চক্রবর্তী ভারতীয় রেলপথের কর্মচারী ছিলেন এবং সেই সূত্রে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেছেন। তাই তুলসী কলকাতায় তাঁর জ্যাঠার কাছে থাকতেন। তিনি একসময় যাত্রার নেপথ্যগায়ক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন জীবিকার মধ্যে দিয়ে

হরিধন মুখোপাধ্যায়

গিয়েছেন। উত্তর কলকাতার হোটেলের কর্মচারী থেকে ব্রহ্মদেশের সার্কাস পার্টির ক্লাউন পর্যন্ত সব জীবিকাতেই তিনি ছিলেন সমান স্বচ্ছন্দ। সিরিয়াস ফিল্মের অভিনেতাও ছিলেন তিনি। তুলসী কখনও মেকআপ ব্যবহার করতেন না। তাঁর সাদা ধুতি ও পৈতে পরা চেহারাটাই দর্শকের মনে চিরন্তন হয়ে আছে।

উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন অভিনীত 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এ তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয়। ওই দুজনের সঙ্গে তিনি 'একটি রাত' ও 'চাওয়া পাওয়া'তেও অভিনয় করেছিলেন। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত পথের পাঁচালিতে তাঁর অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৬১ সালের ১১ ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

শেষজীবনে তিনি দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর একটি টিভি অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রীকে দেখে দর্শকদের মনে হয়েছিল প্রকৃতই তিনি অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে আছেন। দারিদ্রের জন্যই তুলসীকে তালতলা থেকে তাঁর কর্মস্থল শিবপুর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে হতো। তাঁর অভিনীত 'বিপাশা' (১৯৬২) চলচ্চিত্রটি তাঁর মৃত্যুর পর মুক্তি পায়। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' (১৯৬১), 'মায়ামৃগ' (১৯৬০), 'দীপ জ্বেলে

তুলসী চক্রবর্তী

যাই' (১৯৫৯), 'অযান্ত্রিক', পরশপাথর ইত্যাদি তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্র।

এই ভাবে হরিধন ও তুলসী চক্রবর্তী এই দুই অভিনেতা জীবনেরই উপাদান। সিরিয়াস ও কমেডিকে একই সঙ্গে মিলিয়ে অসাধারণ সিরিও কমেডি অভিনয়ে উত্তীর্ণ করেছিলেন। ▮

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২৯।।

শেষে ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে কার্যকর্তারা তাঁকে বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন। সেই ছিল ডাক্তারজীর শেষ ভাষণ।

ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সামান্য সেবাও করতে পারিনি। আজ দর্শন করতে এসেছি। স্বয়ংসেবক হিসেবে বন্ধুত্বের ভাবে আমরা বাঁধা। আমাদের ভালোবাসা বন্ধুত্বকেও ছাপিয়ে যাওয়া উচিত। আসেতুহিমাচল হিন্দু সমাজকে আমাদের সংগঠিত করতে হবে। এই কাজের মাধ্যমেই দেশ সবল হবে, বৈভবসম্পন্ন হবে। সঙ্ঘকাজই আমার জীবনব্রত, এই মন্ত্র অন্তরে অঙ্কিত করতে হবে।

একবার গাড়িতে যেতে যেতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সঙ্ঘের পথসঞ্চলন দেখেন। ডাক্তারজী সম্পর্কে তিনি আগেই অনেক কিছু শুনেছিলেন। ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করার তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল। নাসিকে ডাক্তারজী অসুস্থ থাকাকালীন তিনি খবরও পান। তারপর নিজে নাগপুরে এসে...

বাঃ, এ তো ডাক্তার হেডগেওয়ারের সঙ্ঘ! তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে।

কিন্তু ভাগ্যে দেখা হওয়া ছিল না।

থাক, ওঁকে কষ্ট দেবার দরকার নেই। আমার নমস্কার জানিয়ে দেবেন।

ডাক্তারজীর শরীর কারাপে দিকেই যেতে থাকলো। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। একটু সুস্থ হলে ঘটাটেজীর বাংলোতে নিয়ে আসা হলো।

লাম্বার পাংচার করতে হবে।

দাঁড়ান, আমাকে একটু সময় দিন।

চলবে